ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

মোগল আমলে বাংলার শাসন কাঠামো: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মো. শাহ আলম মিয়া*

সারসংক্ষেপ: ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করার মাধ্যমে ভারতে মোগল শাসনের সূচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন প্রথম বাংলা জয় করেন। তিনি ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের চৌসার যুদ্ধে শেরখানের নিকট পরাজিত হলে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলর কররানী আফগান শাসনের অবসান হয় এবং বাংলা প্রদেশ মোগল সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোগল শাসন ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তা বস্তুত সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হয়েছিল। এ সময় কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করত কিন্তু এখানে বার ভূঁইয়াদের বিরোধীতার দরুন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সুবাদার ইসলাম খানের প্রচেষ্টায় বাংলায় মোগল শাসন কার্যকরী হয়। মোগল শাসকগণ বাংলার শাসন কাঠামোকে সুন্দর করার জন্য বাংলাকে, সুবা, সরকার, পরগনায় বিভক্ত করে সুবাদার, দিওয়ান, বখশী, সদর, কাজী, মীরবহর, মুহতাসিব, কোতোয়াল, ওয়াকেয়ানবিস সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।[১] এ যুদ্ধের পর বাবর দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময় বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল এবং সৈয়দ বংশীয় সুলতান নাসির-উদ্-দীন নসরত শাহ তখন বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাবর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে হয়ত বাংলাদেশে ও হামলা চালাইতেন। কিন্তু সুলতান নসরত শাহ স্বীয় কূটবুদ্ধির দ্বারা বাংলাদেশকে মোগল আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করেন। শীঘ্রই বাবরের মৃত্যু হলে মোগলদের বাংলাদেশ আক্রমণ সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কিন্তু নসরতের ভাই গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ স্বীয় নির্বুদ্ধিতার দরুন স্বাধীনতা হারান।[২] ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন প্রথম বাংলা জয় করেন। কিন্তু বাংলায় তাঁর অধিকার কয়েক মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন আফগান বীর শেরখান সূরের নিকট পরাজিত হয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান।[৩] ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরখান সূর গৌড়ে ফরিদউদ্দীন আবুল মুজফ্ফর শেরশাহ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন।[৪] অতঃপর শেরশাহ হুমায়ুন নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কূলীকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড় অধিকার করেন এবং বাংলায় আফগান শাসন

* গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] হুমায়ূন গৌড়ের নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ এবং এ তাৎপর্যপূর্ণ নামের মধ্যে বাংলার সহিত হুমায়ূনের স্বল্পকালীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্মৃতি স্মরণীয় হয়ে থাকে।[৬] হুমায়ুন দীর্ঘ পনের বছর রাজ্য হারা অবস্থায় দেশ হতে দেশান্তর দু:খ দুর্দশার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে পারস্য সম্রাট শাহতাহমাস্প এর সাহায্যে তিনি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৭]

অতঃপর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার সময় সুর বংশীয় সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুর স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। তিনি ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে আকবরের সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁকে বাধা দেন। অতঃপর গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুর আর মোগল সীমা অতিক্রম করতে সাহস করেন নি। বরং খান-ই-জামানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্-দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল শাহ বাংলার সুলতান হন কিন্তু তিনিও পিতার অনুকরণে মোগল সেনাপতির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেন। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজখান কররানী বাংলার সুলতান হন এবং পর বছর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সোলাইমান কররানী সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বছর বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি মোগল রাজশক্তির প্রতি সর্বদা সজাগ ছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোগলদের বিরুদ্ধাচরন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়ে গেছে। সোলায়মান কররানী আকবরের কোপদৃষ্টিতে না পড়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এ কারণে তিনি স্বনামে কোনো মুদ্রা প্রচলন করেন নি বা ততদিন আকবর ও বাংলাদেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেন নি। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে সোলায়মান কররানীর মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজীদ সুলতান হন, কিন্তু তাঁর হঠকারিতা ও দুর্ব্যবহারের জন্য আমীররা তাঁকে সরাইয়া তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দায়ুদ খান কররানীকে সিংহাসনে বসান।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার কররাণী আফগান শাসনের অবসান হয় এবং এ প্রদেশ মোগল সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোগল শাসন ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তা বস্তুত সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হয়েছিল। আকবর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা মোগল আমলে কার্যকরী ছিল।[৮] সম্রাট আকবরের সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করত।[৯] প্রকৃতপক্ষে এখানে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। বার ভূঁইয়া নামে অভিহিত বাংলার জমিদারদের বিরোধিতার দরুন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর এ জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সুবাদার ইসলাম খানের কর্মকুশলতার ফলে বারভূঁইয়ারা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং বাংলাদেশে মোগল শাসন কার্যকরী করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়।[১০] ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম মোগল সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় আসেন।[১১] ইসলাম খান ও তাঁর পরবর্তী সুবাদারগণ কুচবিহার,

কামরূপ, কাচাড়, জয়ন্তিয়া ও ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম জয় করে বাংলা সুবার সীমান্ত সুরক্ষিত করেন এবং এর অধিবাসীদের শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন।[১২]

বাংলার রাজধানী

রাজধানী মূলত প্রশাসন ব্যবস্থার মূলকেন্দ্র। তাই এ বিষয় আলোচনা করা দরকার। ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ারের শাসনকালে লখনৌতি বা গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। তিনি দেবকোটেও তাঁর শাসনের শেষের দিকে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। তার পরবর্তী বাংলার শাসনকর্তাদের সময়ে গৌড় এ প্রদেশের রাজধানী ছিল। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে গৌড় ও পাণ্ডুয়া শহরদ্বয় রাজধানীর মর্যাদা বহন করে। কররাণী আফগানের শাসনকালে গৌড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাজ খান কররাণী গৌড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে তানডায় নূতন শহর নির্মাণ করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলার প্রথম সুবাদার খান খানান মুনিম খান প্রথমে তানডাকে রাজধানী করেন। এরপর গৌড় নগরের সুরম্য প্রাসাদরাজী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তানডা থেকে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কয়েক মাস পরে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার দরুন গৌড়ে প্লেগ রোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বহু লোক, মোগল সৈন্য ও কর্মচারির মৃত্যু হয়। তখন সুবাদার মুনিম খান গৌড় ত্যাগ করে তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুনিম খান তানডার উপকণ্ঠে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার পরবর্তী বাংলার সুবাদার খান জাহান হোসেন কুলী খান, মুজাফফর খান তুরবার্তী ও অন্যান্য সুবাদারগণ তানডাতে অবস্থান করেন।[১৩]

সম্রাট আকবরের আমলের বাংলার শেষ সুবাদার রাজা মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৫) তানডা হতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি নূতন রাজধানী শহরের নাম দেন আকমহল বা আকবর মহল। পরে এ নাম রাজমহল নামে পরিচিত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে প্রথম দুই সুবাদার কুতুবুদ্দীন কোকা ও জাহাঙ্গীর কুলী রাজমহলে অবস্থান করেন। ইসলাম খান চিশতী যখন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, রাজমহল বাংলা সুবার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এবং পূর্ববাংলার শক্তিশালী জমিদারদেরকে দমন করার জন্য এবং সুবা শাসনের সুবিধার্থে বাংলার কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন করে রাজমহল হতে পূর্বদিকে অগ্রসর হন। মুসা ও তাঁর মিত্র জমিদারদের বিরুদ্ধে ইছামতি নদীর নৌযুদ্ধে জয়লাভের পর যাত্রাপুর ও ডাকচেরা দুর্গদ্বয় দখল করে ইসলাম খান ঢাকার দিকে অগ্রসর হন। তিনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করে এখানে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন।[১৪] সুবেদার ইসলাম খান রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থাপন করেন। এরপর হতে প্রায় একশত বছর ধরে ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। এরপর ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকূলী খান ঢাকা হতে রাজধানী সরিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান।[১৫]

সুবা

মোগল আমলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশ ছিল। সম্রাট আকবর সুবা শাসনের সুন্দর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সুবা শাসন ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী ছিল। সুবার শাসন সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন ছিল। কেন্দ্রীয় ও সুবা শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব সম্রাটের হাতে ছিল। প্রদেশে যাতে সুবাদার স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা অথবা স্বাধীনতা অবলম্বন করতে না পারে সেজন্য সম্রাট আকবর সুবা শাসন পদ্ধতি সংগঠনের বিষয়ে কয়েকটি নীতি অবলম্বন করেন।[১৬] প্রথমত, তিনি সুবা শাসন কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারি নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কর্মচারির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখিতভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, শাসন ব্যবস্থা এরূপ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে একজন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারি অন্য বিভাগের প্রধান কর্মচারির যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা। সৃষ্টি করতে পারেন এবং এদের সহযোগিতার ফলে প্রাদেশিক শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। চতুর্থত, সুবা শাসন ছিল কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতির ক্ষুদ্র সংস্করণ। সুবায় যে সব প্রধান কর্মচারি ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসনেও অনুরূপ বিভাগীয় কর্মচারি বা মন্ত্রী ছিলেন। সুবার বিভাগীয় কর্মচারিগণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট তাঁদের কার্যের জন্য দায়ী থাকতেন এবং কেন্দ্রের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিজেদের বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। সম্রাট আকবর যে সুবা শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাহা সমগ্র মোগল আমলে প্রচলিত ছিল।[১৭]

সুবাদার

সুবাদার ফার্সি শব্দ যার অর্থ তত্ত্বাবধান বা দিক নির্দেশক।[১৮] মোগলদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে সুবে বাংলার শাসন কার্য পরিচালিত হত। সুবাদার ছিলেন সুবে বাংলার প্রধান প্রশাসক।[১৯] তিনি নাযিম এবং সিপাহসালার নামেও অভিহিত হতেন। সুবাদার, কেন্দ্রীয় উকিল ও উজীর বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সাধারণত সরকার কর্তৃক অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু কখনো কখনো রাজ পরিবারের যুবরাজ ও উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের সুবাদার পদে নিয়োগ করা হত।[২০] প্রধানমন্ত্রী সুবাদারের শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করতেন এবং সুবাদার তাঁর দায়িত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন। প্রদেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিদ্রোহ দমন করা, সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করা এবং প্রাদেশিক প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সুবাদারের দায়িত্ব ছিল। এর ফলে, সুবাদারের পক্ষে প্রদেশে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুবাদারকে সাধারণতঃ চার-পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নিয়োগ করা হত এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্য কোনো আমীরকে প্রদেশের সুবাদার নিয়োগ করা হত।[২১]

মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সুবাদারদের তুলনায় বাংলাদেশের সুবাদারদের পক্ষে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। বাংলা সুবা সম্রাটের রাজধানী হতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, ইহা একটি সমস্যাসংকুল প্রদেশ ছিল। জমিদারদের বিরোধিতার দরুন বাংলায় মোগল শাসন কার্যকরী করতে বহু সময় লেগেছিল। তৃতীয়ত, সুবাদার ইসলাম খান জমিদারদেরকে দমন করে এক বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। এ সুযোগে তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অন্যান্য কর্মচারিদেরকে তাঁকে কুর্নিশ করতে বাধ্য করেন। সম্রাটের অনুকরণে ইসলাম খান ঝারোকায় বসতেন। সম্রাটের অনুমোদন ব্যতিরেকে তিনি কর্মচারিদেরকে কঠিন দণ্ড দিতেন। ইসলাম খানের এ সব কার্যকলাপের খবর পাইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে সতর্ক করে এক ফরমান জারি করেন। সম্রাট তাঁকে ঝারোকায় বসতে, কুর্নিশ আদায় করতে ও কঠোর দণ্ড দিতে নিষেধ করেন।[২২]

দিওয়ান

দিওয়ান শব্দটি ফার্সি হতে উদ্ভূত। এটি পারসিকদের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। এ বিভাগে আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা হত। মোগল আমলে দিওয়ান শব্দ দ্বারা অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের প্রধানকে স্পষ্টভাবে বুঝাতো। সুবাদারের পর প্রাদেশিক দিওয়ান সুবায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূণ কর্মকর্তা ছিলেন।[২৩] প্রত্যেক সুবায় একজন দিওয়ান নিযুক্ত হতেন। সাম্রাজ্যের প্রধান দিওয়ানের পরামর্শে প্রাদেশিক দিওয়ান নিয়োগ করা হত। প্রধান দিওয়ান প্রাদেশিক দিওয়ানের কার্যের তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাঁকে আদেশ-নির্দেশ দিতেন। প্রদেশের অর্থের দায়িত্ব প্রাদেশিক দিওয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্বের আয়-ব্যয়, হিসাব-নিকাশ এবং রাজস্ব-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। তাঁর অনুমোদন ব্যাতীত সুবাদার প্রদেশের রাজকোষ হতে টাকা ব্যয় করতে পারতেন না এবং টাকার জন্য সুবাদারকে দিওয়ানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। এ জন্য দিওয়ানের সহিত সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা না করে চলিলে সুবাদারের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ত। বাংলার সুবাদার কাসিম খানের সহিত দিওয়ান মির্যা হোসেন বেগের বনিবনা হয় নাই। কাসিম খান মির্যা হোসেন বেগ ও তাঁর পুত্রদেরকে আটক করেন এবং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এটা জানতে পেরে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার ও দিওয়ানের বিবাদের তদন্তের জন্য কর্মচারি পাঠান। তদন্তের ফলে সুবাদারের অপরাধ প্রমানিত হয় এবং কাসিম খান দিওয়ানকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। কাসিম খান পরবর্তী দিওয়ান মুখলিস খানের সহিতও বিবাদ করেন। তখন সম্রাট কাসিম খানকে অপসারিত করেন।[২৪]

বখশী

প্রদেশের সামরিক বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্তকর্তা ছিলেন একজন বখশী। তিনি কেন্দ্রীয় বখশীর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন।[২৫] সাধারণত কেন্দ্রের সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে মোগল আমলে মীর-বখশী বলা হত।[২৬] বখশী তাঁর কার্যের জন্য মীর বখশীর নিকট দায়ী থাকতেন। তিনি প্রদেশের মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের প্রশিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও যোগ্যতার তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি এদের প্রশিক্ষা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না

হইলে সৈন্য ও মনসবদারদের বেতন বন্ধ করতে পারতেন। তিনি প্রদেশের সামরিক ব্যাপারে সুবাদারকে পরামর্শ দিতেন এবং প্রয়োজনমত অভিযানের ব্যবস্থা করতেন।[২৭]

সদর

প্রদেশের সদর সাম্রাজ্যের সদর-ই-সুদূরের (প্রধান সদর) পরামর্শে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সদর তাঁর কার্যের জন্য প্রধান সদরের নিকট দায়ী থাকতেন। তিনি প্রদেশের ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রদেশে কাযী না থাকিলে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সুপারিশে ধার্মিক, শিক্ষিত, এতিম প্রভৃতি লোকদেরকে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষ্কর জমি ও অন্যান্য প্রকারের সাহায্য দেওয়া হত। তিনি এদের দেখাশুনা করতেন।[২৮]

কাজী

প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন কাজী। তিনি প্রধান কাজী কর্তৃক নিয়োজিত হতেন।[২৯] কাজী সাম্রাজ্যের প্রধান কাজীর অধীন ছিলেন।[৩০] প্রাদেশিক কাজী স্বীয় অধীনস্থ কাজীদের নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রয়োজনীয় তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রভৃতি তত্ত্বাবধান এবং এতদসংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন।[৩১] বিচারকার্যে কাজীর সাহায্যের জন্য একজন মীর আদল নিযুক্ত হতেন।[৩২]

মীর বহর

বাংলা সুবা নদীপ্রধান ছিল এবং সামরিক প্রয়োজনে এ প্রদেশে নৌবহর রাখতে হত। মীর বহর এ নৌবহরের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রয়োজনমত সুবাদার ও বখশীকে তাঁর নৌশক্তি দিয়ে সাহায্য করতেন। বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করতে, কুচবিহার, কামরূপ ও আসাম অভিযান এবং মগদেরকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জয় করতে নৌবহর বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৩৩]

মুহতাসিব

রাজধানী শহরের লোকের ধর্মীয় চরিত্র ও নৈতিক জীবন তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন মুহতাসিব নিয়োগ করা হত। লোকের ধর্মকর্মে শিথিলতা ও নৈতিক জীবনে অধোগতি দেখা দিলে মুহতাসিব যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি শাস্তিরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সমাজের কলুষতা দূর করে ধর্মভাব ও নীতিবোধ সমাজজীবনে রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব ছিল।[৩৪]

কোতোয়াল

সুবা বা প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন কোতোয়াল।[৩৫] অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য রাজধানী শহরে একজন কোতোয়াল বা নগরপাল নিয়োগ করা হত। কোতোয়াল সুবাদারের অধীন ছিলেন এবং সুবাদারের তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগের প্রধান। তাঁর অধীনে সুবার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে শহরগুলোতে বহু কর্মচারি ছিল। এরা নিজেদের এলাকায় কোতোয়ালের তত্ত্বাবধানে এদের কর্তব্য পালন করত। নগরে প্রবেশের জন্য কোতোয়ালের অনুমতি প্রয়োজন হত। কোতোয়াল চোর-

ডাকাত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। তিনি শহরের সব রকম গুরুত্বপূর্ণ খবর সুবাদারের গোচরীভূত করতেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।[৩৬]

ওয়াকেয়ানবিস

মোগল যুগে প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে ওয়াকেয়ানবিস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। ওয়াকেয়ানবিস ছিলেন প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। মূলত প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণী পেশ করার জন্য ওয়াকেয়ানবিসদেরকে নিযুক্ত করা হত।[৩৭] তিনি সুবাদার দিওয়ান প্রভৃতি কর্মচারিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে এবং স্থানীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে সবরকম তথ্য সম্রাটকে লিখে জানাতেন। তদনুযায়ী সম্রাট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।[৩৮] কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তাদের দ্বারা ঘটনা চেপে রাখার সম্ভাবনা থাকার কারণে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ কল্পে সুবার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়েন্দারূপে গোপন সংবাদদাতা নিয়োগ করা হত।[৩৯]

সরকার

মোগল শাসনকালে বাংলা সুবা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে একজন ফৌজদার নিযুক্ত হতেন। সরকারের শাসন, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি তাঁর দায়িত্ব ছিল। তিনি সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ ও আইন-কানুন তাঁর এলাকায় কার্যকরী করতেন। ফৌজদার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সুবাদারের অধীনে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর এলাকায় বিদ্রোহ দমন তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্নীতি জমিদার ও প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায়ে ফৌজদার পরগণার কর্মচারি আমিলদেরকে সৈন্য সাহায্য করতেন। ফৌজদার ১০০০ থেকে ২০০০ মনসবদার ছিলেন। তিনি প্রয়োজনের সময় সুবাদারকে সৈন্য সাহায্য করতেন। আবার সুবাদার সম্রাটের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব প্রদর্শন করলে তিনি তার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন।[৪০]

ফৌজদারের নিয়োগের সময়ে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁকে লিখিত নির্দেশনা দেওয়া হত। এ নির্দেশনামায় তাকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নীতি অনুসরণ করতে উপদেশ দেওয়া হত এবং প্রজাদের প্রতি যাতে কোনো অন্যায় ও অবিচার না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হত। সরকারের ফৌজদার ব্যাতীত আরও কয়েকজন কর্মচারি ছিল। এরা সরকার শাসনে ফৌজদারকে সাহায্য করত।[৪১]

পরগণা

মোগল শাসন ব্যবস্থায় শিকদার ছিলেন পরগণার প্রধান। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে তিনি পুলিশ ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বও পালন করতেন। কখনো কখনো পরগণার শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফৌজদার ও

কোতোয়ালের দায়িত্বাবলিও শিকদারের ওপর ন্যস্ত করা হত। সাধারণভাবে পরগণার সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য শিকদার ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। শিকদার জায়গীরদার ও দারোগা পরগণার অর্ন্তগত শহরে সমাজ বিরোধী ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকদের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের প্রতি সজাগদৃষ্টি রাখতেন। পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে আমিল প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত ছিলেন। তাঁকে সরাসরি কৃষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কাজ সম্পন্ন করতে হত। উক্ত প্রধান দায়িত্ব ব্যাতীত গ্রাম প্রধানদের সাথে একত্র হয়ে পরগণার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুরাচার লোকদের শাস্তি প্রদানের কাজে শিকদারকে আমিল সহযোগিতা করতেন। একইভাবে অবাধ্য কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আমিলকে শিকদারও সাহায্য করত।[৪২]

আমিলের কাজে সাহায্যের জন্য পরগণায় আরও কয়েজন কর্মচারি ছিল। এদের মধ্যে আমীন, কারকুন, খাজাঞ্চী ও কানুনগো উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আমীন প্রজাদের রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব বহন করতেন। আমীন মুনসেফ নামেও অভিহিত হতেন। তিনি সরেজমিনে প্রজাদের জমির অবস্থান, গুণাগুণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। কারকুন ছিলেন পরগণার রেজিষ্ট্রার বা লেখক। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির কাগজপত্র এবং রাজস্বের হিসাব-নিকাশের জন্য দায়ী ছিলেন। প্রত্যেক পরগণায় একজন খাজাঞ্চী নিয়োগ করা হত। খাজাঞ্চী প্রজাদের ও জমিদারদের নিকট হতে খাজনা গ্রহণ করতেন এবং এর হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। খাজাঞ্চী খাজনাদার এবং ফোতাহদার নামেও অভিহিত হতেন। পরগণার স্থানীয় প্রধানদের মধ্য হতে একজন কানুনগো নিয়োগ করা হত। তিনি স্থানীয় রাজস্ব প্রথা ও রীতিনীতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে কানুনগো অর্থাৎ আইনের প্রবক্তা বলা হত। বস্তুত রাজস্ব রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন একটি চলন্ত অভিধান।[৪৩]

তাহা ছাড়া পরগণায় কয়েকজন চৌধুরী ছিলেন। চৌধুরী আধা-সরকারি ও আধা-বেসরকারি কর্মচারি ছিলেন। তিনি প্রজাদের অভাব-অভিযোগ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিনিধিত্ব করতেন। গ্রামের রাজস্ব আদায় ও শান্তি রক্ষার ভার ছিল মুকাদ্দম বা গ্রামের প্রধান ব্যক্তির ওপর। পাটোয়ারী গ্রামের হিসাব রক্ষার কাজ করতেন। মুকাদ্দম ও পাটোয়ারী আদায়কৃত রাজস্ব পরগণার আমিলের নিকট দাখিল করতেন। তাঁদের দায়িত্বের জন্য তাঁরা রাজস্বের কিছু অংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ পেতেন।[৪৪]

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মোগল আমলে বাংলার শাসন কাঠামোকে সুন্দর ও সুগঠিত করতে মোগল শাসকগণ বাংলাকে সুবার মর্যাদা দিয়ে বাংলাকে সুবা, সরকার, পরগনায় বিভক্ত করেন এবং সুবাদার, দিওয়ান, বখশী, সদর, কাজী, মীরবহর, মুহতাসিব, কোতোয়াল, আমীল, শিকদারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করেন। যার ফলে মোগল

শাসনামলে বাংলার শাসন কাঠামো একটি শক্তিশালী ও সুশৃংখল শাসনকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তথ্যনির্দেশিকা

[১] জে. এম. বেলাল হোসেন সরকার ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ ও পাকভারতের ইতিহাস* (ঢাকা: মানামা প্রিন্টার্স, ১৯৮৯) পৃ. ২২১।

[২] আব্দুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪), পৃ. ৪৪৩।

[৩] কে.এম. রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা* (ঢাকা: সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ১৯৯৭), পৃ. ৫১৪।

[৪] কে.এম. রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ. ৫১৪।

[৫] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: মর্ডান টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লি:, ১৯৭৭), পৃ. ৩৪০।

[৬] *তদেব।*

[৭] ড. কিরন চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: ভাস্কর প্রিন্টার্স, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ২২২।

[৮] *তদেব*, পৃ. ৩৩৫।

[৯] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: ইতিকথা প্রিন্টিং ও ওয়ার্কস পুনর্মুদ্রণ, ২০১০), পৃ. ৩০১।

[১০] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪০।

[১১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ৩০১।

[১২] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪০।

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৩৪১।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

[১৫] আব্দুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭৪), পৃ. ৪৫৯।

[১৬] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪২।

[১৭] *তদেব।*

[১৮] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব (১৫৩৮-১৬১৩)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), পৃ. ১০৪।

[১৯] কে.এম. রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ. ৫১৪।

[২০] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৪।

[২১] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

[২২] *তদেব*, পৃ. ৩৪৩।

[২৩] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৫-১০৬।

[২৪] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।

[২৫] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৮।

[২৬] ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: ইসলাম প্রিন্টার্স, পূর্ণমুদ্রণ, ১৯৮৯), পৃ. ১৩২।

[২৭] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৪।

[২৮] *তদেব।*

[২৯] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৮।

[৩০] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৫।

[৩১] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৮।

[৩২] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৫।

[৩৩] *তদেব।*

[৩৪] *তদেব।*

[৩৫] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৮।

[৩৬] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৫।

[৩৭] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৯।

[৩৮] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৬।

[৩৯] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১০৯।

[৪০] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৬।

[৪১] *তদেব।*

[৪২] মোহাম্মদ নাজিমুল হক, *বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল আফগান দ্বন্দ্ব*, পৃ. ১১০।

[৪৩] ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৭।

[৪৪] *তদেব*, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।